ভোরের কাগজ ১৬

তারিখ ...JAN. 27.1999. ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ৭....

ক্ষুব্ধ শিক্ষকের প্রতিবাদ

আবু তাহের খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র শিক্ষক অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ সম্প্রতি একটি প্লাকার্ডে লেখা সংক্ষিপ্ত ভাষায় তার ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ করেছেন। খবরে প্রকাশ, উক্ত প্লাকার্ড নিয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের দিন ঘণ্টা চারেক তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, যেখানে সমিতির নির্বাচনের ভোট গ্রহণ করা হচ্ছিল। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, মূলত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই তিনি ঐ প্লাকার্ড প্রদর্শন করছিলেন। উক্ত প্লাকার্ডে লেখা ছিল, 'আমি ক্ষুব্ধ, আমি অপমানিত। অনাচার-দুরাচারমুক্ত, জ্ঞান-বিলাসী সুস্থ বিশ্ববিদ্যালয় চাই।'

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে নানা কারণে নানাভাবে নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজ করছে এবং সেখানে মৌলিক জ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার প্রতি বিমুখতা যেভাবে ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে, তার প্রেক্ষিতে দেশের শিক্ষিত সচেতন মানুষের মনে যে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের প্লাকার্ডের সংক্ষিপ্ততম ভাষায়। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনাচার-দুরাচারের ব্যাপারে এর আগেও প্রতিবাদ হয়েছে। তবে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্রমবিমুখতার বিষয়টি নিয়ে এর আগে কাউকে আর এরূপ প্রকাশ্যে কথা বলতে খুব একটা দেখা যায়নি।

ধারণাগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে উচ্চতর জ্ঞানের এমন এক পীঠস্থান যার পরিধি শুধু প্রচলিত জ্ঞানের চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না— একই সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠান জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুনতর ধারণা, মাত্রা ও তথ্যেরও সংযোজন ঘটাবে; এবং তা করার স্বীকৃত কৌশলটি হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন ও গবেষণা। আর এ অধ্যয়ন ও গবেষণার সঙ্গে ছাত্র ও গবেষক ছাত্ররাতো জড়িত থাকবেনই। তবে তারচেয়েও বেশি করে জড়িত থাকবেন শিক্ষকগণ। কিন্তু সে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন ও গবেষণার সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শতকরা কতো ভাগ শিক্ষক সংশ্লিষ্ট রয়েছেন?

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে একটি প্রধান অভিযোগ এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, পড়াশোনা ও পাঠদান ফেলে রেখে তারা লাগাতার কনসালটেন্সি করে বেড়ান। সবাই যে তা করেন, তা নয়। তবে এ কনসালটেন্সি করা শিক্ষকের সংখ্যা এতো বেশি যে, দেখলে মনে হয় কনসালটেন্সিই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মূল পেশা— গবেষণা ও পাঠদান তাদের খণ্ডকালীন সময়ের দায়িত্ব মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিশেষজ্ঞ সেবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারবে না, তা নয়। বরং বহু ক্ষেত্রে তারাই হতে পারেন বিশেষজ্ঞ মতামত বা পরামর্শ দানের মূল উৎস। উদাহরণ স্বরূপ : একটি নতুন শিক্ষা বা কৃষি বা পরিবেশ নীতি প্রণয়ন করতে হলে, কোনো সংস্কারের প্রশ্ন উঠলে, কিংবা এ জাতীয় অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পরামর্শ বা মতামত গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই এবং সাধারণত তা করা হয়েও থাকে। বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজে আমাদের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ যে জড়িত ছিল, সেটিও নিঃসন্দেহে তাদের এ ধরনের অবদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের একটি অংশে দাতাদের প্রয়োজন ও পছন্দমাফিক যে সকল প্রকল্পে যে ধরনের কনসালটেন্সিতে নিয়োজিত থাকছেন, তাকে স্রেফ অর্থ উপার্জনের অতি স্থূল কৌশল ভিন্ন অন্য কিছু হিসেবে গণ্য করার এতোটুকু সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য অর্থ উপার্জন কোনো অবৈধ কাজ নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখতে হবে সে উপার্জন তারা নিজ পেশার প্রতি দায়িত্বশীল ও সৎ থেকে করছেন কিনা।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গবেষণা কর্মের ফলাফল হচ্ছে প্রবন্ধ, পুস্তক ইত্যাদির প্রকাশ। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তকের সংখ্যা ও মান দুনিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণাজাত প্রবন্ধ ও পুস্তকের গুণগত পর্যায় ছিল বিশ্বমানের, যখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ছিল এখনকার চেয়ে অনেক কম। সত্যেন বোসের বিশ্বনন্দিত কোয়ান্টাম তত্ত্ব, যা বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব নামে পরিচিত, তা তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালীন সময়ের গবেষণারই ফসল। রমেশ চন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালীনই রচনা করেছিলেন 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল,' যা আজও 'বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্পর্কে... প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে সুধীমহলে স্বীকৃত।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা সেই সময়ের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে (৩১ ডিসেম্বর '৯৬-এর হিসাব অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ১৩২৬ জন)। গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি এবং গবেষণা ও অধ্যয়নের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও বহুলাংশে বেড়েছে। মোট কথা, নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এখানকার শিক্ষকদের অবদান রাখবার সুযোগ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু সেসব সুযোগ-সুবিধার বিপরীতে তাদের সে অবদান কোথায়? কিছু কিছু শিক্ষক যে নিজেদেরকে অধ্যয়ন ও গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখেননি, তা নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা, খুবই নগণ্য এবং সমাজ ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয় স্থানেই তাদের অবস্থান খুবই গোবেচারা ধরনের। বরং লেখাপড়া ও গবেষণার কাজ বাদ দিয়ে রাজনৈতিক লাইন যারা ঠিকমতো রক্ষা করেছেন, তাদের অবস্থানই সেখানে অধিকতর সংহত হয়েছে এবং নানাভাবে তারা সফলতাও অর্জন করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ইদানীং টুকটাক প্রবন্ধ, বইপত্র ইত্যাদি যা কিছু লিখছেন, শোনা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা তারা লিখছেন পদোন্নতির ন্যূনতম শর্ত পূরণের জন্য— গবেষণার তাগিদ থেকে নয়। ভাগ্যিস পদোন্নতির শর্তের সঙ্গে ন্যূনতম পর্যায়ে হলেও লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এ জাতীয় কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ইদানীং টুকটাক প্রবন্ধ, বইপত্র ইত্যাদি যা কিছু লিখছেন, শোনা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা তারা লিখছেন পদোন্নতির ন্যূনতম শর্ত পূরণের জন্য– গবেষণার তাগিদ থেকে নয়। ভাগ্যিস পদোন্নতির শর্তের সঙ্গে ন্যূনতম পর্যায়ে হলেও লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এ জাতীয় কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া আছে।

পড়াশোনা বা লেখালেখির উপরোক্ত শর্তাদি আরোপিত থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পড়াশোনার সঙ্গে নিজেদেরকে কতোটা সম্পৃক্ত রাখছেন তার একটি নমুনা পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোর পাঠকক্ষে শিক্ষকদের উপস্থিতি এবং তাদের নামে গ্রন্থাগার থেকে ইস্যুকৃত বই সংখ্যার রেকর্ড থেকে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, এ উভয় ক্ষেত্রেই চিত্র বড়োই করুণ।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিশ্চয় জ্ঞানের কোনো বদ্ধ প্রকোষ্ঠ নয়। সমাজের প্রতিও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি দায় রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বেশির ভাগ সময়ই সমাজের নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে নিজেদের জ্ঞানপ্রসূত মতামত ও পরামর্শ দিয়ে অতি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সমস্যা ও সঙ্কটেও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরকে তাদের বিশেষজ্ঞ মতামত বা পরামর্শ নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয় বা ইস্যুতে পক্ষে-বিপক্ষে বিবৃতি দেন। কিন্তু প্রায়শ তারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তিগুলোকে জনগণের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন না। ফলে এ জাতীয় বিতর্ক শেষ পর্যন্ত ঝগড়ায় পরিণত হয়— বিতর্ক শেষে তা থেকে কোনোপ্রকার জাতীয় ভিত্তিক ঐকমত্য গড়ে ওঠে